আঠারো শতকের ইউরোপীয় সমাজ–রাজনীতি ও অর্থনীতির কাঠামো

(ধারণা পাঠ, পঞ্চম সেমিস্টার, ইতিহাস মেজর)

সুদীপ্ত সাধুখাঁ

আঠারো শতক ইউরোপের ইতিহাসে এক রূপান্তরেরয় যুগ। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর ভাঙন, বাণিজ্য ও উপনিবেশ বিস্তারের উত্থান, আলোকায়ন আন্দোলনের বুদ্ধিবাদী প্রবাহ, কৃষি ও শিল্পে নতুন প্রযুক্তির আগমন এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বদল—সব মিলিয়ে এটি ছিল আধুনিক ইউরোপের ভিত্তি গড়ে ওঠার একটি বিশেষ সময়। ইউরোপের প্রতিটি অঞ্চল এই পরিবর্তনের সঙ্গে সমানভাবে তাল মেলাতে পারেনি। পশ্চিম ইউরোপ, পূর্ব ইউরোপ এবং দ্বীপভূমি ইংল্যান্ড—এই তিন অঞ্চলের সমাজ, রাজনীতি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো আলাদা আলাদাভাবে বিকশিত হয়। এই ভিন্নতা ইউরোপের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলে।

আঠারো শতকের পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের বেড়াজাল ক্রমশ শিথিল হচ্ছিল। কৃষিজীবী শ্রেণির অবস্থান পরিবর্তন হচ্ছিল। মধ্যযুগে কৃষকের জীবন ছিল জমিদারের অধীনস্থ। কিন্তু আঠারো শতকে কৃষিক্ষেত্রে নতুন ভাগচাষ প্রথা, ভাড়াটিয়া কৃষকের উত্থান, এবং জমির বাজার প্রসারের ফলে কৃষকের ওপর নিয়ন্ত্রণ অনেকটা দুর্বল হয়ে আসে। কৃষকেরা ভাড়া করা জমিতে স্বাধীন উৎপাদক হিসেবে কাজ শুরু করে। কেউ কেউ নগরে পাড়ি জমায়। তারা হস্তশিল্প, মুদ্রণ, দর্জির কাজ, বয়নশিল্প, জাহাজ নির্মাণ, ব্যাংকিং এবং ছোট ব্যবসায় যুক্ত হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে নগরায়ণ বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের বিভিন্ন বড় শহর—লন্ডন, আমস্টারডাম, প্যারিস,

ভেনিস, লিসবন—বাণিজ্য ও শিল্পের কেন্দ্রে রূপ নেয়। সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন সামাজিক শ্রেণির জন্ম হয় যা পরবর্তীকালে বুর্জোয়া শ্রেণি নামে পরিচিত হয়। তারা ভবিষ্যতের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম এই পরিবর্তনের গুরুত্ব বর্ণনা করে লিখেছেন—**"The eighteenth century witnessed the uneasy transition from feudal bonds to capitalist energies."** এই উক্তি সমাজগত পরিবর্তনের প্রকৃতি স্পষ্ট করে।

অন্যদিকে, পশ্চিম ইউরোপের অভিজাত শ্রেণির অবস্থান কিছুটা সংকুচিত হয়। তাদের জমিদারি থেকে আয় কমতে থাকে। বাণিজ্য, নৌ চলাচল, বিদেশী উপনিবেশ লাভ এবং শিল্প থেকে যে বিপুল সম্পদ প্রবাহিত হচ্ছিল, তা মূলত বণিকদের হাতে জমা হচ্ছিল। বিশেষ করে নেদারল্যান্ডস ও ইংল্যান্ডে বণিক শ্রেণির অর্থনৈতিক শক্তি অভিজাতদের তুলনায় বেশি পরিলক্ষিত হয়। যদিও ফ্রান্সে অভিজাতরা এখনও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রভাব ধরে রেখেছিল, তবে আর্থিক দুর্বলতা তাদের ভিত্তি নড়বড়ে করে তোলে।

পূর্ব ইউরোপে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রাশিয়া এবং প্রাশিয়ার মতো দেশে সার্ফডম দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল। কৃষকেরা জমির সঙ্গে বেঁধে রাখা ছিল। তারা জমিদার বা প্রভুর অনুমতি ছাড়া স্থান পরিবর্তন বা পেশা পরিবর্তন করতে পারত না। সার্ফদের শ্রম ছিল অল্প মজুরি বা বিনা মজুরির। জমিদার শ্রেণি কৃষকের শ্রম থেকে উচ্চ পরিমাণ ভাড়া ও উৎপাদিত ফসল আদায় করত। ইতিহাসবিদরা এই পরিস্থিতিকে **"the second serfdom"** নামে অভিহিত করেছেন। তাই পূর্ব ইউরোপে বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান প্রায় হয়নি। নগরায়ণও ছিল নগণ্য। সমাজ ছিল কৃষিভিত্তিক, স্থবির এবং প্রথানির্ভর। এই সমাজ কাঠামো পরবর্তী শতকে শিল্পবিপ্লবে তাদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রাজনৈতিক কাঠামোতেও পশ্চিম ও পূর্ব ইউরোপের বিভাজন স্পষ্ট ছিল। পশ্চিম ইউরোপের কিছু দেশে সাংবিধানিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৬৮৮ সালের 'গৌরবময় বিপ্লব'-এর পরে রাজাকে সংসদের আইনের অধীন থাকতে হয়। সংসদ কর আরোপ, আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রবিষয়ে সিদ্ধান্তের মূল নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। এই ধারা আঠারো শতকে আরও শক্তিশালী হয়। ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে। কিন্তু একই সময় ফ্রান্সে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র টিকে ছিল। লুই চতুর্দশ এবং তার উত্তরসূরিরা শক্তিশালী রাজশক্তির প্রতিনিধিত্ব করলেও রাষ্ট্রের আর্থিক সংকট ও রাজনৈতিক অসন্তোষ ক্রমে বেড়েই চলছিল। ফলে আঠারো শতকের শেষভাগে বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে।

নেদারল্যান্ডস ও সুইজারল্যান্ডে তুলনামূলকভাবে প্রজাতান্ত্রিক শাসনের রীতি দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্বৈরাচারী ছিল। রাশিয়া পিটার দ্য গ্রেটের সময়ে সামরিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট এই রাজনৈতিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেন। তিনি পশ্চিম ইউরোপের নানা ধারা গ্রহণ করলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেননি। প্রাশিয়ার হোহেনৎসোলার্ন শাসকেরা একটি কঠোর সামরিক রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল কেন্দ্র ছিল সেনাবাহিনী। প্রুশিয়া সম্পর্কে ফ্রেডরিক দ্য গ্রেট বলেছিলেন—**"Prussia is not a state with an army, but an army with a state."** এই উক্তি রাষ্ট্রের প্রকৃতি তুলে ধরে।

অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও পশ্চিম ইউরোপে বিপুল পরিবর্তন ঘটে। আটলান্টিক বাণিজ্যের বিস্তার ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসকে সমৃদ্ধ করে। ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকাকে যুক্ত করে গড়ে ওঠে ত্রিভুজাকার বাণিজ্য।

দাসবাণিজ্য, চিনিশিল্প, তুলো, মসলাজাত দ্রব্য, তামাক ও চায়ের বাণিজ্য অর্থনীতিকে বহুগুণ গতিশীল করে। ইংল্যান্ডে কৃষি বিপ্লব ঘটে। জমি সংযুক্তিকরণ, চাষের ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি, যন্ত্রের ব্যবহার, এবং বৈজ্ঞানিক কৃষিকৌশল উৎপাদন বাড়ায়। কৃষিক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রম ক্রমে শিল্পক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। আঠারো শতকের শেষভাগে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব শুরু হয়। এই বিপ্লবের নেপথ্যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন, যান্ত্রিক তাঁত, কয়লা খনি উন্নয়ন, লৌহশিল্পের আধুনিকীকরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার উত্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লন্ডন ইউরোপের আর্থিক রাজধানীতে পরিণত হয়।

পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক শক্তির বিপরীতে পূর্ব ইউরোপে অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল স্থবির। উৎপাদন পুরনো পদ্ধতিতে পরিচালিত হতো। কৃষকরা সার্ফ হওয়ায় শ্রমের স্বাধীন চলাচল ছিল না। শিল্পবিকাশ সীমিত ছিল। রাশিয়া বা প্রুশিয়ায় যে শিল্প পাওয়া যেত, তা প্রধানত রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণের জন্য। বেসরকারি উদ্যোগ বা বাজারভিত্তিক শিল্পায়ন সেখানে বিকশিত হয়নি। ফলে পূর্ব ইউরোপ অর্থনৈতিক শক্তিতে পশ্চিমের অনেক পিছনে পড়ে যায়।

ইংল্যান্ডের অবস্থান আঠারো শতকে বিশেষভাবে ব্যতিক্রমী। ভৌগোলিক অবস্থান তাকে মহাদেশীয় যুদ্ধ থেকে আংশিক সুরক্ষা দেয়। শক্তিশালী নৌবাহিনী তাকে বিশ্বের বাণিজ্যপথ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেয়। ১৭০৭ সালের ইউনিয়ন আইনের ফলে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড মিলিত হয়ে ব্রিটেন গঠিত হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের সুরক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং মুক্ত বাণিজ্যের পরিবেশ দেশটিকে দ্রুত শক্তিশালী করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকায় বিস্তৃতি লাভ করে। ভারত, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ক্যারিবীয় অঞ্চল ব্রিটিশ প্রভাবের অধীন আসে। লন্ডন আর্থিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

বিশ্ববিদ্যালয়, রয়্যাল সোসাইটি এবং আবিষ্কারের প্রসার শিল্পায়নে সহায়তা করে। এ কারণেই আঠারো শতকের শেষে ইংল্যান্ড এক বৈশ্বিক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। ইতিহাসবিদ হবসবম বলেছেন—**"Britain's rise in the eighteenth century was the product of a unique fusion of commerce, navy and industrial energy."**

এইভাবে আঠারো শতকের ইউরোপ ছিল বহুস্তরীয় পরিবর্তনের যুগ। পশ্চিম ইউরোপ সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে অগ্রসর হচ্ছিল। পূর্ব ইউরোপ এখনও সার্ফডমের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। ইংল্যান্ড এই দুই ধারার বাইরে দাঁড়িয়ে এক নতুন শিল্পসমাজের জন্ম দিচ্ছিল। এই বিভাজন ইউরোপের পরবর্তী ইতিহাস, বিশেষ করে উনিশ শতকের বিপ্লব, জাতীয়তাবাদ, শিল্পবিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদের গতিপথ নির্ধারণ করে। আঠারো শতকের এই ধারাবাহিক পরিবর্তন আধুনিক ইউরোপের ভিত্তি স্থাপন করে এবং বিশ্ব ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।